এই রাত তোমার আমার

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

উত্তর লণ্ডনের বাউণ্ডস গ্রিন পল্লির এক টিপিকাল ডিট্যাচড ইংলিশ কটেজের দোতলার ঘরে একলা বসে তিন দিক মোড়া বেউইণ্ডোর কাচের বাইরের নীল আকাশ, ফর্সা মেঘ আর সবুজের উপর সবুজ চাপানো এর-ওর-তার আর ঈশ্বরের বাগান দেখছিলাম। জানলাটাকে ফ্রেম ভাবলে যেন গোটা একটা কনস্টেবল চোখের সামনে দাঁড় করানো। মন ভরানো এবং নাচানোর জন্য এর চেয়ে মারাত্মক দৃশ্য হয় না, আর তা যে হচ্ছে না, তাও হয়তো নয়। কিন্তু, থেকে থেকেই একটা মধুর বেদনা এসে সব ছেয়ে ফেলছে যখনই মনে পড়ছে আজ মহাষ্টমী।

যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৭৭-এ পন্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে 'রাগ-অনুরাগ' বইয়ের কাজ করতে লণ্ডনে গিয়ে প্রথম পুজোর সময় কলকাতা ছাড়া হয়েছিলাম। কুঁদ হয়ে ছিলাম লণ্ডনে ততদিন, যদ্দিন না পুজোর কথাটা এল; আর এল তো এল মা-এর একটা চিঠি ভর করে। সেই চিঠিরই উত্তর লিখছিলাম আমার কাচে-ঘেরা নির্জন ঘরে বসে অক্টোবরের নরম রোদের সকাল দেখতে দেখতে। মা লিখেছিলেন; অমুক অমুক তারিখে পুজো পড়েছে এ বার। শুনেছি, লণ্ডনেও

বড়ো পুজো হয়, তুমি তার কোনো একটাতে সময় করে যেও। গঙ্গাতর্পণ তো হবে না, তবে মহালয়ার ওই তারিখটায় বাবাকে, কাকাকে মনে করে একটু ধ্যান কোরো। আর পুজোর জন্য একটা নতুন জামা কিনে নিয়ে ওই সময়টায় পোরো। কী করলে আমায় জানিয়ো।

সেটাই লিখছিলাম মাকে। লিখলাম—তোমায় লিখেছি কিছুদিন আগে যে, লণ্ডনের চেয়ে সুন্দর শহর বোধ হয় নেই পৃথিবীতে। আজ অষ্টমীর সকালে অনবরত মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আমার জন্য কলকাতার চেয়ে সুন্দর শহর নেই। আর একটু পর কলকাতার প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে যখন আলো জ্বলে উঠবে, আমি মনে মনে ওই সব পাড়ায় পৌঁছে যাব। যদিও এখানকার বেলসাইজ পার্কের বড়ো পুজোয় আমার যাওয়ার কথা আছে একজন বিশিষ্ট বাঙালি ভদ্রলোক নিশীথ গাঙ্গুলির সঙ্গে। আর তোমার কথামতো একটা নতুন নীল সোয়েটার কিনে পরছিও, শীতের কারণে আর জামা কেনা হল না।

আমি সত্যিই মা-কে কোনো স্তোক দিচ্ছিলাম না, মা-ও জানতেন পুজোর সময় আমার কলকাতা ফেলে স্বর্গে যাওয়ারও মন হবে না। হাজার হোক, তিনশো ষাট দিন তো কলকাতায় কষ্ট পেয়ে বাঁচি পাঁচটা রাতের জন্য—পুজোর তিনটে রাত, কালীপুজোর একটা রাত আর ইংরেজি নতুন বছরের রাতটুকু। আরও ছোটো বয়সে আরও তিনটে রাতও জীবনে ছিল। সরস্বতী পুজোর আগের প্যাণ্ডেল বাঁধার রাত, বড়োদিনের রাত আর মধ্য কলকাতায় আমাদের ক্রিক রো পাড়ায় কালীপুজোর পরপর ভানু বোসের সারারাত জলসার রাত। যখন মঞ্চে রক্তমাংসের উত্তমকুমার দেখছি, শুনছি ধনঞ্জয়, শ্যামল, মানব, সতীনাথ, ইলা, আলপনা, প্রতিমা, বাঁশরী, উৎপলা। এই এত সব রাতের শুরুই হত দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর রাতে, আর শেষ হত সরস্বতী পুজোর আগের রাতে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অবশ্যই আমাদের ভেবে গান করেননি এই রাত তোমার আমার', কিন্তু, ওই গানটাই কেবল বোঝাতে পারে

পুজোর রাতে আমাদের মনের অবস্থা। নিতান্ত কৈশোরেই, ক্রিক রো-র সংলগ্ন মহেন্দ্র সরকার স্ট্রিটের বিরাট পুজোর সন্ধ্যারতি দেখতে দেখতে, কী করেই যেন হঠাৎ একদিন টের পেয়ে গেলাম এ হচ্ছে প্রেমে পড়ার রাত। অথচ, প্রেম যে কী, সেটাই যথেষ্ট মালুম নেই।

না জেনে, না বুঝে ভালো লাগাই নাকি প্রেম। না জেনে, না বুঝে প্রেমে পড়াই নাকি পুজো। রবীন্দ্রনাথের গানে প্রেম আর পূজার গান কখন কীভাবে আলাদা হয়, সে তো আমি গীতবিতান না দেখলে বুঝতেও পারি না, আর বোঝার পরেও সবসময় মানতেও পারি না। তেমনই, দুর্গাপুজো যে কী করে, কী করে চারধারে আমার প্রেমের মরশুম ছড়িয়ে দিত, তা বুঝতে হঠাৎ দেখলাম কেমন যেন সাবালক হয়ে গেছি আর মেয়েদের দিকে অত খোলা চোখে তাকাতে পারছি না। প্যাণ্ডেলে তো থাকতেন একটাই দেবী আর দুই sub-দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। কিন্তু আমাদের সেই কিশোর চোখের উপর দিয়ে ভেসে যেত কত সে লক্ষ্মী, সরস্বতী। আমরা গালে হাত দিয়ে ভাবতাম মেয়েরা সত্যিই কী সুন্দর। তারপর আরও তলিয়ে ভাবতাম, আহা রে, সারাবছর এরা কোথায় থাকে। কারও নাম শুনছি রত্নু, কারও লাইট, কারও জয়শ্রী, কারও তনুশ্রী, কারও পৃথা। এই সময় আমি একটু গানকাতুরে হয়ে পড়তাম আর মাথায় খেলত পুজোর গান বলে দাগ কেটে বসা সব বাংলা আধুনিক। হেমন্তর ‘তোমার আমার কারও মুখে কথা নেই’, লতার ‘আকাশপ্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে’ মান্নার ‘আমি সাগরের বেলা, তুমি দুরন্ত ঢেউ’, শ্যামলের ‘সারা বেলা, আজি কে ডাকে’, সুবীরের ‘মোনালিসা তুমি কে, বলো না আর অতি অবশ্য মানবেন্দ্রর ‘আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি/ তবু মনে হয়/ কেন আরও ভালোবেসে যেতে পারে না হৃদয়। এইসব গান মনে খেললে ওই পূর্ণ আনন্দের মধ্যে একটা অভাববোধও ঈষৎ জাগত; কেন এই চলমান সরস্বতীদের মধ্যে কেউ আমাদের জন্য গায়

না সন্ধ্যার প্লে ব্যাক, এ শুধু গানের দিন, এ লগন গান শোনাবার কিংবা গীতার মতো করে, 'তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার'। প্যাণ্ডেলে বসে বসে এভাবেই এক এক ঘণ্টায় আমাদের এক এক মাস করে বয়েস বেড়ে যেত। পুজো চলে গেলে, শেষে মনের যে দশা দাঁড়াত তা জ্ঞান গোঁসাইয়ের রাগপ্রধানেই কিঞ্চিৎ ধরা যায়—'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয়, ফিরে আয়। এই পাখিটা যে বিগত পুজো, না বুকের ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া শরতের বাতাসটুকুর মতো ওইসব রতু-পৃথারা, তা আর স্পষ্ট করে বলতে পারব না। রবীন্দ্রনাথের গানের মতো আমাদের জীবনেও প্রেম ও পুজো মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

২.

অরুন্ধতী রায়-এর উপন্যাস থেকে কথাটা তো চালু হল এই সেদিন, কিন্তু চিরকালই আমরা মা দুর্গাকে জেনে এসেছি God of Small Things বলে। অর্থাৎ, ব্যাপারটা ছিল, কথাটা ছিল না। কত অজস্র টুকিটাকি জিনিসের জন্যই যে তখন আমরা ঠায় চেয়ে থাকতাম দুর্গাপুজোর দিকে। জুতোয় পেরেক উঠে গেছে, পা বাঁচিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি, তবু জুতো কেনার কথা তুলব না, তিনটে মাস হজম করে নেব। কারণ, এখন কিনলে পুজোয় আর নতুন জুতো পরা হবে না। নতুন ক্লাসের শুরুতে, জানুয়ারি মাসে, ইশকুলের ইউনিফর্ম কেনার একটা প্রথা ছিল; এ ছাড়া সব শৌখিন জামার জন্যই অপেক্ষা থাকত পুজোর। দিদিদের দেখতাম, বছরের কোনো একসময় একটা ভালো উপহার পেলে সেটা প্রাণে ধরে বাঁচিয়ে রাখত পুজোর জন্য। পাড়ার অনেক বাড়িতেই পুজোর সময় ঘটা করে রেডিয়ো কেনা হত অধিকাংশ বাড়িতেই রেডিয়ো ছিল না—ফলে, রেডিয়ো ঢুকলে সে বাড়ির খুব মর্যাদা বাড়ত। আর যাদের বাড়িতে কলের গান ছিল, তাদেরকে তো রীতিমতো ধনী জ্ঞান করা হত। সেইসব বাড়িতে পুজোর সময় কেনার সামগ্রীর মধ্যে থাকত

সে-বছরের শারদ অর্ঘ্যের কিছু রেকর্ড। আমার বাবার মৃত্যুর পর বাড়ির পুজোর কেনাকাটার বহর কমে গেলেও কাকা বা মা এই পুজোর গানের রেকর্ড কেনা বন্ধ করেননি, কারণ পুজোর সময় কলের গানে নতুন গান না বাজলে বাড়িতে পুজো ঢুকত না। পুজো আসত কিছু পুজোসংখ্যা আর বেশ কিছু বইয়ের হাত ধরেও। পুজোর অনেকখানি আগে থেকেই পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে দিব্যি বৈঠক বসে যেত কেনাকাটা নিয়ে। হ্যাঁ রে তুই কী কিনলি? ম্যাচিং ব্লাউজ কিনতে পারলি? রোলেক্স জরির শাড়ি ক-দিন চলে রে? জানিস তো, বেনেবাড়ির রুমঝুম আস্ত একটা বেনারসি কিনে বসেছে? ওর বিয়েটিয়ে আছে নাকি সামনে?—এহেন এক-শো এগারোটা মেয়েলি কথা শুনতেই হত এ-বাড়ির বারান্দায়, ও-বাড়ির উঠোনে, কী সে-বাড়ির ছাতে। কোন বাড়ির কেনাকাটা কাকে টেক্কা দিল, তাও শুনতে হত। বাবার মৃত্যুর পর আমার জামা-প্যান্টের সংখ্যা কমে যেতে আমি এইসব মা-মাসি-দিদি-বউদিদের আড্ডা থেকে পালিয়ে বাঁচতাম। নইলে তো থুতনি নেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করবে, সাহেবের ক-টা জামা হল এ বার? আমাকে তখন জামার সংখ্যা বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিথ্যে কথা বলতে হবে। ভারি রাগ হত, কেউ কেন জিজ্ঞেস করে না, কী রেকর্ড কেনা হল রে? কিংবা কী বই?

আজ, এত দিন পর, ওই সব ন্যাকা-ন্যাকা কথাগুলোই বড় মধুর করে স্মৃতিতে বাজে। মনে পড়ে, একটা মাইসোর স্যাণ্ডাল সোপ হারিয়ে যাওয়াতে একটা মেয়ের সে কী কান্না! সবাই বলছে, মোটে তো দশ আনা দাম। আর একটা কিনলেই হয়। কিন্তু সে-কথা কে বোঝায় তাকে? সে শুধু বলে, পুজোর সাবানটাই হারিয়ে ফেললাম, ছি ছি! এর চেয়ে নিজেই হারিয়ে গেলে পারতাম।

বলতে নেই, পুজোতে সব ছেলেপুলেই আমরা একটু-আধটু হারিয়ে যেতাম। প্যাণ্ডেল বাঁধা দেখতে দল বেঁধে গেলাম গোমেস লেনে, তারপর সেখান থেকে সুরি লেনে, তার পর ডিক্সন লেনে, শেষে বৈঠকখানা বাজারেই। সেখানে দল

ভাগাভাগি হয়ে কে যে কোথায় গেল, ভগাই জানে। তখন একে-ওকে খুঁজতে খুঁজতে কখন যে ফের পাড়ার প্যাণ্ডেলে এসে হাঁপাতে লাগলাম, সেও ভগাই জানে। শুধু মনে পড়ে দুপুরের দিকে এ-পাড়া ও-পাড়া করে এক-এক রাস্তায় এক-এক রকমের রোদের খেলা দেখা হত। নীল আকাশ থেকে সোনালি রোদের ঠিকরে এসে এক-এক রাস্তায় এক-এক স্টাইলে, অ্যাঙ্গেলে পড়া হত, এক-এক বাড়ির দেওয়ালে এক-এক চালে খেলা করত রোদ। কালো পিচের রাস্তায় রোদের ওই ওঠা পড়া দিয়েই আমরা টের পেতাম শরৎকাল কতখানি মজেছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে আমার সহপাঠী ও রুমমেট জন্মান্ধ দেওকিষেণ শর্মা— যে জীবনে কখনো রোদ দেখেনি, কী গ্রীষ্মের, কী শীতের-শরৎকে বলত হিমবসন্ত, স্রেফ গায়ের উপর রোদের ছোঁয়া বুঝে। আর, আমরা তো সেই স্বর্ণালি রোদ চোখে পান করব বলে পাড়া ডিঙিয়ে বেড়াতাম।

কিন্তু, রোদের সঙ্গে সব মাখামাখিই কিন্তু পুজোর রাতগুলোর টানে। সারাবছরে অমন স্বাধীনতা আর কটা দিনই বা, যখন ট্রামে-বাসে আর পায়ে হেঁটে শহরটাকে প্রায় চষে ফেলা যেত। পর দিন রেল মেরে বন্ধুদের শোনানো যেত ফায়ার ব্রিগেডে রমেশ পালের প্রতিমা কেমন হল, সংঘশ্রীর প্যান্ডেলের কেরামতিটা কী, কিংবা হিন্দ সিনেমার উলটো ফুটে গোপাল পাঁঠার পুজোয় কী সুন্দর দেখানো হয়েছে মায়ের সামনে রামচন্দ্রের আঁখিপদ্ম দানের উপাখ্যান। তবে, সব বৃত্তান্তই শোনানোর দরকার হত প্যাণ্ডেলের চত্বরে, যেখানে লাল-নীল হলুদ-গোলাপি ফ্রকে উদ্ভাসিত বালিকারা আপন মনে করে যাচ্ছে মধুবালা, সুচিত্রা, নূতন, ওয়াহিদার পোশাক, হাসি, নাচ ও হাঁটার গল্প। সবাই সবাইকে আড় চোখে দেখছে আর হাত-মুখ নেড়ে কথা কইছে, কেউ জানতেও পারছে না কার মনের ক্যামেরায় কার মুখের ছবি চিরতরে বন্দি হয়ে গেল। এইসব নিষ্পাপ স্মৃতিগুলোর মধ্যে একটা দৃশ্য খুব মনে পড়ে, ’৫৫

সালের পুজোতে মাইকে বাজছে 'আনারকলি' ছবিতে লতার গান, 'ইয়ে জিন্দেগি উসিকি হ্যায় বো কিসিকা হো গয়া' আর একটা একরত্তি মেয়ে সেটা গলায় তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে আপ্রাণ।

পুজোর সময় মেয়েদের বর্ধিত স্বাধীনতার মধ্যে ছিল নতুন ড্রেসের সঙ্গে খুব গাঢ় করে ঠোঁটে লিপস্টিক, গালে রুজ মেখে বেরোনোর সুযোগ। কনক' ও 'কান্তা'-র যুগে এক আধ জন খুব ঈর্ষণীয় হত পাঁচ কি দশ টাকা দামের 'ইভনিং ইন প্যারিস' ব্যবহার করে। বাবার কিনে দেওয়া, তাই যখের ধনের মতো আগলানো, ক্যালিফোর্নিয়ান পপি' বা 'ইয়ার্ডলে' মা দিদিদের গায়ে ছিটিয়ে দিতেন। আমার গায়ে একবার আদর করে ইভনিং ইন প্যারিস' মাখিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে একটি মেয়ে আমার গায়ে নাক ঘষে গন্ধ নিতে লাগল। আমি বদ্ধ হাবা, সেই নাকঘষার মানেই ধরতে পারেনি, ভেবেছি, কী বেজায় গন্ধ রে বাবা। বুঝিনি পুজোর রাত ওর মাথা খেয়েছে।

৩.

এখনকার মতো তখনও পুজোয় কলকাতা ছেড়ে পুরী, যশিডি, শিমুলপুর, সিমলা যাওয়ার চল দেখেছি। কেউ কেউ রাঁচিও যেত। স্টাইলের ওপর কেউ কেউ বলত, এবার পশ্চিমে চললাম। তাদের ঘটা করে যাওয়াটা আমরা বারান্দা বা জানলা দিয়ে দেখে মনে মনে হাসতাম। এত তাড়াতাড়ি রাঁচি যাওয়ার কী হল? পরে একটা ব্যাখ্যাও বার করে ফেলতাম—পুজোয় কলকাতা ছাড়লে রাঁচি ছাড়া আর কোথায় যাবে? যে প্রতিবেশী বেনেবাড়ি পুজোয় পশ্চিমে যেত তাদের ছেলে-মেয়েরা ফিরে এসেই জানতে চাইত পাড়ার রকমসকম কেমন ছিল পুজোর সময়। এক লক্ষ প্রশ্ন ওদের, ওদের ট্যুর নিয়ে আমাদের কোনো জিজ্ঞাস্যই নেই। আমরা কেবল ভরে আছি পুজোর স্মৃতিতে। আমাদের এক বন্ধুকে বাড়ির বড়োরা টেনে হিচড়ে শেয়ালদা

স্টেশন অব্দি নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে কান্নাকাটি জুড়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে একা ফেরত আসে। কেন যাবে না? তা হলে বড়োবাজার থেকে কিনে আনা দোদমা, বোম আর তুবড়ি কে ফাটাবে? কালীপুজোর পটকা ফাটানো তো হালকা চালে শুরুই হবে দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী থেকে।

আমরা যারা কলকাতার পুজো ছাড়া বাঁচতে পারতাম না তাদের বাড়িতে একটু স্থানাভাব হত পুজোর সময়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আত্মীয়স্বজনরা ওই সময় থাকতে আসতেন আমাদের বাড়িতে। তাদের মুখে কত গল্প—খুলনার রূপসা নদীর, গোয়ালন্দ বন্দর কি বেনাপোল-পেট্রাপোল সীমান্তের। জায়গায় টান পড়ত বলে ফরাশ পাতা হত, আমরা ছোটোরা গাদাগাদি করে শুয়ে রাতের বেলায় না-দেখা পিতৃভূমি, মাতৃভূমির গল্প শুনতাম। আর অতিথিদের খালি খোঁজ পুজোয় মায়ের নতুন চেহারা কী? সুচিত্রা-উত্তম কি বিয়ে করেছে? বিধান রায় কি সত্যিই নাড়ি টিপে রোগ ধরেন? অর্গাণ্ডি আসলে কী কাপড়? আর তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সওয়াল : ভাগ্যশ্রীর সম্বন্ধ চাই, মনা তোমাদের এহেনে ভালো পাত্তর আছে?

স্বজন আসত অনেক বাড়িতেই উত্তর আর পশ্চিম ভারত থেকে। তারাও খুঁজছে পাত্র বা পাত্রী। পুজো শেষ হলে আমাদের বাড়িতে পূর্ববঙ্গস্থিত মামা-মাসিদের মেয়েদের পাত্রী হিসেবে দেখানো হত। পরে শীত-বসন্তে তাদের কয়েক জনের বিয়েও হয়েছে। তারা চলে যেতে নির্জনে চোখের জল মুছেছি। তারপর নতুন করে দৃষ্টি মেলেছি আগামী পুজোর দিকে।

পুজো মানে ছিল সিনেমা এবং থিয়েটার। মা-মাসিদের জন্য ম্যাটিনি শোয়ের অ্যাডভান্স টিকিট কিনে আনায় হাতযশ ছিল দাদার। পাড়ার উঠতি যুবাদের এলেম ধরা পড়ত লাইন দিয়ে সুচিত্রা-উত্তমের বায়োস্কোপের টিকিট জোগাড়ে। সেজন্য সেই যুবারা একটা করে পাঁচ সিকের টিকিট বখশিস পেত।

পুজোর সময় পাড়ার অনেক যুবাই প্রতিবেশী যুবতীদের সঙ্গলাভের আশায় মা-মাসিদের দলে ভিড়ে যেত।

বাল্যে মা-এর সঙ্গে পুজোর সময় ম্যাটিনি শোয়ে প্রাচী সিনেমায় রানি রাসমণি' দেখতে গিয়ে দেখি পাড়ার ডানপিটে ছোকরাদের ভিড়। কী ব্যাপার? তারা কোনো না কোনো মহিলা দলকে এসকর্ট করে এসেছে। বলা বাহুল্য, সেইসব দলে কিছু ক্লাস নাইন, ক্লাস টেনের কুমারী তো আছেই! আমার মা সরল মানুষ, অতশত বুঝতেন না, বললেন দ্যাখো, সবাই ওদের বকাঝকা করে, কিন্তু ওদেরও কীরকম ধর্মের টান।

দুর্গাপুজো নিয়ে একটাই অভিযোগ চিরকাল আমার। পুজোটা কেবল আসে আর যায়, এই এল এই গেল। তিনশো ষাট দিনের অপেক্ষার পর এই ক্ষণিকের উন্মাদনা পোষায়? মহালয়া থেকেই কীরকম হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায়, আর ষষ্ঠী এলে তো প্রতিজ্ঞাই করে বসি, বাকি চার দিন আর একফোঁটা ঘুমোব না! প্যাণ্ডেলে প্রতিমা জেগে থাকবে আর আমি ঘুমোব!

পুজোর রাতগুলোয় তাই এক ভূতেও ভর করত আমাদের। জানলা খুললে কি ছাদে দাঁড়ালে আলোর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ত চোখে-মুখে, মনে। গ্লোব লাইট, টুনি বালব, কি পাইপ লাইটের উদার বিকিরণ। সংগতে মাইকে হেমন্ত, সন্ধ্যা, লতা, গীতার গানের ধ্বনি। গোটা জগৎ তখন যেন সহজ হয়ে আসে। রত্নু, পৃথা তনুশ্রীরা পুজোর জামাতেই প্যাণ্ডেল ছেড়ে এসে ভিড় করেছে জানলায়, বারান্দায়। চোখ ভরে দেখছি পুজো ওদের কত সুন্দর করেছে। দেখছি বেপাড়ারও কত সুন্দরী দলে দলে রাস্তা বেয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে এই রাতটাই শেষরাত, চলে গেলে আর আসবে না। চলে গেলেই ছেলেরা মেয়েরা সবাই কী ভীষণ আলাদা হয়ে যাব। একসঙ্গে ফুচকা খাওয়া, মিষ্টি বরফ বা আইসক্রিম খাওয়া, জলযোগের দোকানে বসে লুচি-ছোলার ডাল খাওয়া শুধুই স্মৃতি হয়ে

যাবে। ভিড় ঠেলে পুজো দেখতে দেখতে কেউ বলবে না, আমার হাতটা ধরো। জুতোয় হিলটা বোধ হয় ভেঙে গেল।

লণ্ডনের বেলসাইজ পার্কের সেই পুজোতে দাঁড়িয়ে হাতে এক প্লেট প্রসাদ নিয়ে এই সবই ভাবছিলাম, হঠাৎ পাশ থেকে এক সুরেলা নারীকন্ঠ-শংকর না? আমি হকচকিয়ে ভাবছি মহিলা যেন কে, কোথায় দেখেছি! সুন্দরী সুন্দর করে হাসলেন, মনে পড়ছে না তো? তুমি তো ক্রিক রো-র। আমিও ক্রিক রো-র। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঠোঁট উপড়ে বেরিয়ে গেল, তুমি পৃথা না? সুন্দরী হাসতে হাসতে মাথা নাড়লেন, মনে পড়েছে তা হলে?

বললাম, মনে না পড়ে উপায় আছে? কত দেখা হত পুজোর রাতে।